ভূমিকা

রাঢ় অঞ্চল ও তার অংশ বিশেষ জৈন ও বৌদ্ধ, পৌরাণিক গ্রন্থ এবং সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। এই অঞ্চল বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণভাগের এক অখণ্ড জনপদকে রাঢ়দেশ বললেও এই রাঢ় অঞ্চলের স্থানিক অবস্থান ও তার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অতি সুপ্রাচীন কাল থেকে বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে আজকের আধুনিকতায় উপস্থিত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই অঞ্চলের সীমানা যেমন বদলেছে তেমনি এই অঞ্চলের মানুষেরা বংশ পরম্পরায় বৃহত্তর জনসমাজ থেকে নানা কারণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কিংবা দীর্ঘকাল ধরে তারা বহু ভাবে শোষণ, অত্যাচার, অবহেলা মুখ বুজে সহ্য করেছে। এমনকি স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা টুকুও তারা পায়নি।

এদেশে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে ঘটে আগস্ট আন্দোলন ও মেদিনীপুরে ভয়ংকর বন্যা (১৯৪২), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা (১৯৪৭), আজাদ-হিন্দ্ আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭)। এরপর দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তি, আর সেই সঙ্গে আসে উদ্বাস্তু সমস্যা। স্বাধীনতাত্তোর ভারতের অর্থনৈতিক সংকট, শ্রেণি সংগ্রাম, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ভূমিবন্টন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বৈষম্য ভারতবর্ষের মানুষকে ধীরে ধীরে নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তে তফাৎ করে দেয়। বৃহত্তর শ্রেণির মানুষ সত্তা খুইয়ে নিম্নবিত্তে পরিণত হয়। এইসব সর্বহারা, নিঃস্ব, নিরন্ন অসহায় মানুষগুলির সামাজিক জীবনকথাকে কাহিনির মধ্যে লেখকরা বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন। ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রভাবে ক্লিষ্ট মানুষের জীবনেতিহাস এড়িয়ে সাহিত্য সৃষ্টি কোনো সাহিত্য-শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সমকালীন পরিস্থিতিতে লেখকরা বলবার ভাষা ও লেখবার বিষয় খুঁজে নিয়েছিলেন। সাধারণভাবে দেশের দারিদ্র্য, বিত্তহীন জনগোষ্ঠী, সামাজিক অন্যায়ের চিত্র ও বিশ্লেষণ তাঁদের লেখায় উঠে এসেছে।

বিস্তীর্ণ রাঢ়ের প্রতিটি অঞ্চলে দারিদ্র সীমার নিচে বাস করা অভাবী মানব গোষ্ঠী কেউ কারোর মতো নয়— তাদের অবয়ব, বিশ্বাস, বৃত্তি, জীবনচর্যা, ভাষা, সংস্কৃতি— সবই পৃথক। কেবল ক্ষুধা তাদের একরকম। এই ক্ষুধা নিবারণের জন্য এই অঞ্চলের অসহায় অন্ত্যজ, দলিত, নিঃস্ব, নিম্নবিত্ত কিংবা দরিদ্র সম্বলহীন মানুষগুলির একমাত্র কায়িক শ্রমই তাদের সহায় সম্বল। শিষ্ট সমাজের সাথে এই অঞ্চলের মানুষদের তেমন যোগ ছিল না। বলা যায়, সংযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে তেমন ভাবে কেউ এগিয়ে আসেননি। তাই এই অঞ্চলের মানুষদের নানান অসংগতি ও অপ্রাপ্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাব, স্বাধীনতা লাভ, দেশ বিভাজন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সর্বোপরি

আত্মিক মূল্যবোধের নিদারুণ অবক্ষয়, অবদমন, সুস্থ পরিবেশের বিকৃত ও নগ্ন রূপ দেখেছেন এবং বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রাণান্তকর চেষ্টায়, অসহায়, দরিদ্র, অজ্ঞ, নিরক্ষর, বোকা মানুষদের প্রতিনিধি হয়ে রাঢ় অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কলম ধরেছেন বেশ কয়েকজন গল্পকার। তাঁদের মধ্যে আমার গবেষণা কর্মে নির্বাচিত দশজন ছোটগল্পকার হলেন— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গুণময় মান্না, মহাশ্বেতা দেবী, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, মানব চক্রবর্তী, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, রামকুমার মুখোপাধ্যায় ও অনিল ঘড়াই। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে জন্মেছেন, ভগীরথ মিশ্র স্বাধীনতার বৎসরে জন্মেছেন। এবং বাকি লেখকেরা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করে সত্তরের দশকে এসে সাহিত্য রচনায় মগ্ন থেকেছেন, যা বাংলা কথাসাহিত্য সৃজনে নতুন গতির সঞ্চার করেছে। পশ্চিম বাংলায় তখন বামপন্থী আন্দোলন ও সত্তরের দশকে নকশালবাড়ির আন্দোলনকে এরা সযত্নে ও সজ্ঞানে পরিহার করেছেন এবং সাহিত্যসেবকের ভূমিকা নিয়ে সাহিত্যচর্চায় গ্রামীণ জীবনকেই বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ফলে, ষাট পূর্ববর্তী দশকগুলির শিল্পভাবনা থেকে এঁদের সাহিত্যচর্চায় বিষয়ভাবনা নি:সন্দেহে স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে।

'বাংলা ছোটগল্পে রাঢ়ভূমির সমাজজীবন (১৯৫০-২০০০) : নির্বাচিত গল্পকার' শীর্ষক আমার গবেষণা কর্মটি ভূমিকা ও উপসংহার বাদে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায় : রাঢ়ের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। দ্বিতীয় অধ্যায় : নির্বাচিত গল্পকারদের নির্বাচিত ও বিশিষ্ট গল্পগুলির আলোকে রাঢ়ভূমির সমাজজীবন। তৃতীয় অধ্যায় : নির্বাচিত গল্পকারদের ছোটগল্পে লৌকিক বিষয় ও উপাদান। চতুর্থ অধ্যায় : নির্বাচিত গল্পকারদের ছোটগল্পে ব্যবহৃত ভাষাশৈলী। পঞ্চম অধ্যায় : সাক্ষাৎকার।

এই অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে রাঢ় অঞ্চলের স্থানিক অবস্থান, ইতিহাস, সংস্কৃতি, দৈনন্দিন জীবনকথা, অর্থনৈতিক অবস্থান, জাতিভেদ তথা শ্রেণিগত বৈষম্য, লৌকিক উপাদান (লোকসঙ্গীত, ছড়া, প্রবাদ, লোকনৃত্য, লোকবিশ্বাস ও সংস্কার ইত্যাদি), লেখকের নিজস্ব ভাষা শৈলীর সাথে আঞ্চলিক ভাষা ও উপভাষার পরিচয় এবং সাক্ষাৎকার অধ্যায়ে দু'জন লেখকের (নলিনী বেরা ও রামকুমার মুখোপাধ্যায়) নিজস্ব মতামত তুলে ধরা হয়েছে। এবং জানা গেছে রাঢ় অঞ্চলের ইতিহাস, সীমানা, ভাষা, গল্প রচনার সমকালীন প্রেক্ষিত, বাস্তবতা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। ফলে, নির্দিষ্ট কালসীমানায় (১৯৫০-২০০০) স্বাধীনতা পরবর্তী রাঢ় অঞ্চলের মানুষদের সমাজজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ আমার এই গবেষণায় উঠে এসেছে।